

নাম: মো: সোহেল আহমদ

জন্ম তারিখ: ১৭ জুন, ২০০৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ২০ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: দিনমজুর,

শাহাদাতের স্থান: নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসে

শহীদেদের জীবনী

সোহেল আহমদ, জন্ম ১৭ জুন ২০০৩ সালে, সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার কাকুরা গ্রামে। সাধারণ এক গ্রামীণ পরিবারে তার বেড়ে ওঠা। তার পিতা তাখলাসুর রহমান একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন এবং মা পারভীন বেগম সংসারের সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আট সদস্যের এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই সীমিত ছিল, কিন্তু সুখ-শান্তিতে দিন কাটছিল তাদের।

সোহেল ছোটবেলা থেকেই খুব পরিশ্রমী ছিল। তার স্বপ্ন ছিল একদিন পরিবারের দারিদ্র্যতা দূর করবে। তবে তার জীবনের বাস্তবতা ছিল কঠিন। পরিবারের আর্থিক চাপ কমাতে সে টাইলসের কাজ করত। কিশোর বয়সেই তাকে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

বড় হওয়ার সাথে সাথে সোহেল নিজেকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলেছিল। ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার মান এবং ছাত্রদের অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলনে शामिल হয়েছিল সোহেলও। সে ছিল সত্যের পক্ষে কণ্ঠস্বর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কিন্তু সেই আন্দোলনই তার জীবনের শেষ পরিণতি নিয়ে আসে। ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সহিংসতার শিকার হয়ে সে প্রাণ হারায়। দেশের অনেক তরুণের মতো সোহেলও এক অকাল মৃত্যুর শিকার হয়, তার স্বপ্নগুলো অপরূপ হয়ে যায়। সোহেলের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, পুরো গ্রামের জন্য ছিল এক গভীর শোকের বিষয়। তার কষ্টের জীবনের শেষটা যেমন ছিল মর্মান্তিক, তেমনি ছিল তার ত্যাগের ইতিহাসও।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

সোহেল আহমদের বাবা তখলিছুর রহমান স্মৃতি চারণ করে বলেন, "সোহেল আমার বড় ছেলে ছিল, অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত নিয়মিত। ছোট বয়সেই সংসারের হাল ধরেছিল, নিজের স্বপ্নগুলো ত্যাগ করে ভাইবোনদের পড়াশোনার জন্য সবকিছু করত। আমাদের পরিবারের জন্য সে ছিল আশার আলো। তার এভাবে চলে যাওয়া মেনে নেওয়া খুব কঠিন।"

ঘটনার বিস্তারিত

২০২৪ সালের ২০ জুলাই বিকেল ৪টার সময় নারায়ণগঞ্জে কারফিউ চলছিল। চারদিকে উত্তেজনা, ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সেই সময়ে বিক্ষোভকারীরা নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো ভবন জুড়ে। সেদিন সোহেল আহমদ সেই ভবনের ৩য় তলায় ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি শাখায় টাইলসের কাজ করছিল। সে তার স্বাভাবিক দিনের কাজ করছিল, জানত না, এটাই তাঁর জীবনের শেষ দিন। ওই ভবনের ৮ম তলায় পুলিশের একটি ক্যাম্প ছিল। বিক্ষোভকারীরা যাতে ওই ক্যাম্পে আক্রমণ করতে না পারে, এইজন্য পুলিশ গेट বন্ধ করে দেয়। এর ফলে যারা ভবনের ভেতরে আটকা পড়ে, তাদের জন্য আর কোনো পথ খোলা থাকেনি। আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর সোহেলসহ তিনজন আগুনে আটকে যায়। পুলিশি গेट বন্ধ থাকায় কেউই নিচে নেমে আসতে পারেনি, বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় পুড়ে সোহেল আহমদসহ তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে পরবর্তীতে ময়নাতদন্তে তাদের পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়। সোহেলের মৃতদেহ যখন তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিয়ানিবাজারের কাকুরা গ্রামে নিয়ে আসা হয়, পুরো গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার হারালো তাদের একমাত্র আশার আলোকে। সোহেল, যে ছোটবেলা থেকেই পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল, সেই সোহেল আর ফিরল না। সে নিজে পড়াশোনা না করলেও, ভাইবোনদের জন্য নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করেছিল। তার স্বপ্ন ছিল, ভাইবোনদের মানুষ করা এবং পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়া। সোহেলের এই অকাল মৃত্যু তার পরিবারকে দিশাহারা করে তুলেছে। আট সদস্যের পরিবার এখন চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি আর নেই। সোহেলের মৃত্যুতে শুধু তার পরিবারের নয়, পুরো গ্রাম এবং তার পরিচিতজনদের স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা

সোহেল আহমদ ছিলেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার একজন পরিশ্রমী যুবক, যিনি দারিদ্র্যতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছিলেন। তার পরিবার ছিল আটজন, যেখানে সবার দায়িত্ব তার কাঁধে। বাবা তখলিছুর রহমান একজন বর্গা চাষী, যার নিজের জমি নেই, পরের জমিতে ফসল ফলিয়ে সংসার চালাবার চেষ্টা করতেন। মা পারভীন বেগম ঘরের কাজ সামলাতেন, কিন্তু দারিদ্র্যের অভিধাপ তাদের জীবন থেকে কখনো কাটেনি। সোহেল টাইলসের কাজ করতেন—কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য উপার্জন, যা দিয়ে পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়া এবং ভাইবোনদের লেখাপড়ার খরচ চালানো ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। তবুও, সোহেল কখনো হাল ছাড়েননি। তার ইচ্ছা ছিল ভাইবোনদের শিক্ষিত করা, তাদের একটা ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া কিন্তু এই স্বপ্নগুলো আজ অসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সোহেল আর বেঁচে নেই। তার হঠাৎ মৃত্যু পুরো পরিবারটিকে এক অবর্ণনীয় শূন্যতার মাঝে ফেলে দিয়েছে। পরিবারের যে আশার আলো ছিল, সেই আলো নিভে যাওয়ার পর সংসারটাও যেন থমকে গেছে। ভাইবোনদের পড়াশোনা, পরিবারের খাবার—সবকিছুই এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে আছে। এই পরিবারের দারিদ্র্যতা এখন আরও করুণ, আরও গভীর। সোহেলের মৃত্যুতে শুধু তার জীবন নয়, পরিবারের সব আশাকেও যেন নিঃশেষ করে দিয়েছে।

প্রস্তাবনা

সোহেল আহমদের পরিবার মূলত তার উপর নির্ভর করতো। শহীদ হওয়ার পরেই পরিবারের রুজি রুটির উপর প্রভাব পড়ে। কারণ সোহেল ছিলো পরিবারের

একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এত বড় পরিবারের জন্য মাত্র একটি কাঁচা ঘর রয়েছে, যাতে তাদের একসাথে বসবাস করা খুবই কষ্টসাধ্য। নতুন একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের জন্য উপকার হতো। বাবার জন্য একটি ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দুমুঠো ডাল ভাতের জোগাড় হবে। সেই সাথে স্কুলগামী ভাই-বোনদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম : মোঃ সোহেল আহমদ

পেশা : দিনমজুর

জন্ম তারিখ : ১৭/০৬/২০০৩

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: কাকুরা, ইউনিয়ন : কাকুরা, থানা: বিয়ানিবাজার, জেলা: সিলেট

পিতা : তখলিছুর রহমান

বয়স : ৫০, পেশা: কৃষি

মাতার নাম : পারভীন বেগম, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪০

পারিবারের সদস্য সংখ্যা : ৯ জন

ভাই বোনের সংখ্যা : ৩ বোন ৩ ভাই

১. রুবেল আহমেদ, বয়স: ১৮, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: জমশেদ আহমাদ উচ্চ বিদ্যালয় ৯ম শ্রেণি

২. জুয়েল আহমদ, বয়স ১২, পেশা: শিক্ষার্থী

প্রতিষ্ঠান: রহমতাবাদ দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদ্রাসা, ৬ষ্ঠ

৩. তুয়েল আহমদ, বয়স: ১১, প্রতিষ্ঠান: কাকুরা সরকারি প্রা: বিদ্যালয়, ৫ম শ্রেণি

৪. ফরিদা খাতুন, বয়স ১৬, প্রতিষ্ঠান: জমশেদ আহমাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ৮ম শ্রেণি

৫. আবেদা খাতুন, বয়স: ১৩, প্রতিষ্ঠা: জমশেদ আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়, ৮ম শ্রেণি

৬. আনজুমা খাতুন, বয়স: ৭, প্রতিষ্ঠান: জমশেদ আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়, ১ম শ্রেণি